অছিয়ত নামা

وصیت نامہ

মূল (ফার্সী) : শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم)

১৯৮৯ সালের জানুয়ারীতে 'অছিয়ত নামা'টি হাতে পাওয়ার দিন থেকেই এরাদা করেছিলাম যে, এটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী ভাই-বোনদের উপহার দেব। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে এতদিন তা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দিন পর সুযোগ পাওয়ায় সর্বাগ্রে আল্লাহ্র প্রতি প্রাণভরা শুকরিয়া আদায় করছি; *আল-হামদুলিল্লাহ*।

প্রত্যেক মানুষের 'অছিয়ত' তার জীবনের শেষকথা হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এরপরেও যদি সেটি লিখিত হয়, তাহ'লে সেটি আরও গুরুত্ব পায় সুচিন্তিত হওয়ার কারণে।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) উপমহাদেশের হানাফী-আহলেহাদীছ সকল মুসলমানের নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হওয়া সকলের জন্য আবশ্যকীয়। সেকারণ আমরা তাঁর 'অছিয়ত নামা' অনুবাদের সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করেছি। যা ইতিপূর্বে আমাদের ডক্টরেট থিসিসে পরিবেশিত হয়েছে। তবে এখানে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

আমরা মনে করি, শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর স্বলিখিত 'অছিয়ত নামা'র মধ্যেই তাঁর সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা ফুটে উঠেছে। আশা করি তা সকল যুগের সংস্কারমনা পাঠকদের চিন্তার খোরাক হবে।

একজন মহান পূর্বসূরীর 'অছিয়ত নামা' অনুবাদ ও প্রকাশ করার তাওফীক প্রদান করায় মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রকাশক 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম জাযা প্রার্থনা করছি। পরিশেষে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

নওদাপাড়া, রাজশাহী
২৬ শে ডিসেম্বর ২০১৮ খৃ. বুধবার।

বিনীত-
অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম ভাগ
অছিয়ত নামা

[আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর উপর ডক্টরেট থিসিসের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে ৫২ দিনের স্টাডি ট্যুরের এক পর্যায়ে ২.১.১৯৮৯ ইং তারিখে লাহোরের বিখ্যাত দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ লাইব্রেরী থেকে ফার্সী ভাষায় লিখিত ১০ পৃষ্ঠার এই দুর্লভ অছিয়তনামাটি মাননীয় অনুবাদক ফটোকপি করে আনেন। যা ১২৭৩ হি./১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে মুদ্রিত।-প্রকাশক]

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি প্রজ্ঞাসমূহ নিক্ষেপকারী ও অনুগ্রহসমূহ প্রবাহিতকারী। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আরব ও আজমের নেতার উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর। যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী। অতঃপর আমি ফকীর অলিউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন!) আমার সন্তানাদি ও বন্ধুদের প্রতি অছিয়ত স্বরূপ এই কথাগুলি বলছি। যার নাম আমি রেখেছি الْمَقَالَةُ الْوَضِيَّةُ فِي النَّصِيْحَةِ وَالْوَصِيَّةِ 'নছীহত ও অছিয়তের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বক্তব্য'। আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক! আর তিনিই সরল পথের প্রদর্শক।

১ম অছিয়ত :

এই ফকীরের প্রথম অছিয়ত এই যে, আক্বীদা ও আমলে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং এ দু'টির গবেষণায় রত থাক। প্রতিদিন এ দু'টির কিছু অংশ পাঠ কর। যদি পড়ার ক্ষমতা না রাখ, তাহ'লে দু'টি থেকে এক পৃষ্ঠা করে অনুবাদ শ্রবণ কর। আক্বীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের বিদ্বানগণের মযহাব অবলম্বন কর। সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান থেকে দূরে থাক, যেসব বিষয়ে তাঁরা অনুসন্ধান করেননি। জ্ঞানপূজারীদের ত্রুটিপূর্ণ সন্দেহ সমূহের দিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। শাখা-

প্রশাখাগত বিষয়ে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের অনুসরণ করবে। যারা ছিলেন ফিক্বহ ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয়কারী। ব্যবহারিক প্রশাখাগত বিষয়গুলিকে সর্বদা কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করবে। যেটি তার অনুকূলে হবে, সেটি গ্রহণ করবে। নইলে পিছনে ফেলে দিবে। উম্মতের জন্য ইজতিহাদী বিষয় সমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। আর যেসব কাটমোল্লা ফক্বীহ (مُتَفَقِّهَ فقهاء) একজন আলেমের তাক্বলীদকে দলীল বানিয়ে নিয়েছে এবং সুন্নাতের অনুসন্ধান থেকে বিরত রয়েছে, তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ওদের থেকে দূরে থেকেই আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করবে।

২য় অছিয়ত :

ন্যায় কাজে আদেশ-এর সীমারেখা সম্পর্কে এই ফকীরের অন্তরে যা নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা এই যে, ফরয সমূহ, কবীরা গোনাহ সমূহ এবং ইসলামের নিদর্শন সমূহের ব্যাপারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ শক্তভাবে কর। যারা এসব বিষয়ে অলসতা দেখায়, তাদের সাথে উঠাবসা করো না। বরং তাদের শত্রু হয়ে যাও। পক্ষান্তরে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ করে যেখানে পূর্বেকার ও পরবর্তী বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, সে সকল বিষয়ে আদেশ-নিষেধে এতটুকুই যথেষ্ট যে, উক্ত বিষয়ে কেবল হাদীছ পৌঁছে দিতে হবে। চাপ সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

৩য় অছিয়ত :

এ যুগের মাশায়েখদের মধ্যে যারা নানাবিধ বিদ'আতে লিপ্ত, তাদের হাতে কখনোই হাত রাখা যাবে না এবং তাদের নিকট বায়'আত করা যাবে না। সাধারণ লোকদের ভক্তির বাড়াবাড়ি ও কারামত দেখে ধোঁকা খাওয়া যাবে না। কেননা সাধারণ লোকের অতিভক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেওয়াজের কারণে হয়ে থাকে। আর সত্যের বিপরীতে রেওয়াজের কোন মূল্য নেই। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ যুগের কারামত ব্যবসায়ীরা তেলেসমাতি ও ভেল্কিবাজিকে 'কারামত' বলে মনে করে। এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা এই যে, অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিষয় হ'ল, মানুষের

মনের কথা জানা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়া। আর এই 'ইশরাফ' ও 'কাশফ' তথা মানুষের মনের কথা জানা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়ার বহু পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলির মধ্যে গোপন ভেদ জানা (باب ضمير) নক্ষত্র বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এটা বুঝে রেখ না যে, নক্ষত্র বিদ্যা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘর সমূহের সমতা (تسوية البيوت)-এর উপর নির্ভরশীল। আর জ্যোতির্বিদ্যার জন্য জন্মতারিখ ও সময় জানা আবশ্যক। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, নক্ষত্র বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তি যখন জেনে নেয় যে, দিনের সময় সমূহের মধ্যে এখন সময় কোন্‌টি, তখন সেখান থেকেই তার কল্পনা রাশিচক্রের (طالع) দিকে ফিরে যায়। অতঃপর সকল ঘর ও নক্ষত্রের ঠিকানা সমূহ তার সামনে এমনভাবে ভেসে ওঠে, যেন ঘরগুলির পৃষ্ঠা তার সামনে রাখা হয়েছে। একইভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি যখন অন্তরে নির্দিষ্ট করে নেয় যে, আমার অমুক আঙ্গুলকে অমুক ঘুঁটি (شكل) এবং অমুক আঙ্গুলকে অমুক ঘুঁটি ধরে নেব, তখন জ্যোতিষীর কল্পনায় এসে যায়, এইসব ঘুঁটি থেকে কি সৃষ্টি হয়। এমনকি তার সামনে পুরা জন্মপঞ্জী এসে যায়। এর মধ্যে 'ভাগ্য গণনা বিদ্যা' অন্যতম। যা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং এ শাস্ত্রটি খুবই বিস্তৃত। এটি কখনো জিনের উপস্থিতিতে ও কখনো অনুপস্থিতিতে হয়। এর মধ্যে 'জাদু বিদ্যা' অন্যতম। যা নক্ষত্রের শক্তিকে একভাবে বন্দী করে এবং সে এর মাধ্যমে 'ইশরাফ' তথা অন্যের মনের কথা জেনে নেয়। জাদু বিদ্যার মধ্যে 'যোগ সাধনা'ও অন্যতম। কোন কোন যোগ সাধকের মধ্যে 'ইশরাফ' ও 'কাশফ' তথা অন্যের মনের কথা জানার ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে ভালভাবে জানতে চায়, সে যেন এসব বিষয়ের বই সমূহ অধ্যয়ন করে।

অন্যের কাজের উপর চাপ সৃষ্টি করা, ভয়াবহ আকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করা, অন্যের হৃদয়ে নিজের হৃদয়ের চাপ প্রয়োগ করা, টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে অনুগত বানানো, এসবই প্রতারণামূলক (نيرنج) বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এরূপ কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে, যা মানুষকে উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু এতে কল্যাণ-অকল্যাণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কবুল হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। একইভাবে উপস্থিতগণের মধ্যে বেহুঁশী ('হাল') ও আকর্ষণ, অস্থিরতা ও আনন্দ সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। এসব অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল পশু প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করা। সেকারণ যার পশু প্রবৃত্তি যত বেশী শক্তিশালী, তার 'হাল'ও তেমনি জোশের হয়ে থাকে। অবশ্য এরূপ কাজ কখনো কোন সৎ লোক সৎ নিয়তে করে থাকে। যা এই কাজগুলিকে 'কারামত' বানিয়ে দেয় না। আর এটি গোপন নয়। আমরা বহু সরল প্রাণ লোককে দেখেছি যে, তারা যখন এইসব কাজ কোন শায়খের মধ্যে দেখে, তখন তারা সেটিকে 'কারামত' বলে নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করে নেয়।

এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল এই যে, হাদীছের কিতাব সমূহ যেমন ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, সুনানে আবুদাঊদ ও তিরমিযী এবং হানাফী ও শাফেঈ ফিক্বহের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা। আর প্রকাশ্য সুন্নাহ (ظاہر سنہ)-এর উপর আমল করা। অতঃপর যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হৃদয়ে সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন এবং তার রাস্তা অনুসন্ধানের আকাঙ্খা বিজয়ী হয়, তাহ'লে ইহসানের কিতাব সমূহ (کتاب عوارف) থেকে ছালাত-ছিয়াম ও যিকর-আযকার দিয়ে নিজের সময়গুলিকে আলোকিত করবে।[১] নকশবন্দী তরীকার পুস্তিকাসমূহ পথনির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে উপকারী।[২] এইসব

১. 'ইহসানের কিতাব' বলতে ইবাদতের কিতাব বুঝানো হয়েছে। যা পাঠ করলে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

২. ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণযুগের পর ভ্রষ্টতার যুগে কথিত ছূফী ও পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে যেসব মা'রেফতী তরীকা সমাজে চালু হয়েছে, সেগুলি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া নামে প্রধান চারটি তরীকায় বিভক্ত। শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ বুখারী নকশবন্দী (৭১৮-৭৯১ হি.) তাঁর মুরীদানকে 'আল্লাহ' শব্দের নকশা লিখে দিতেন। যাতে তারা ধ্যানের মাধ্যমে এ নামের নকশা স্বীয় ক্বলবে প্রতিফলিত করতে পারে। 'নক্বশবন্দ' শব্দের অর্থ 'চিত্রকর'। এ তরীকার ছূফীরা আল্লাহ্র মহিমার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করেন। এ অর্থে তাদের বলা হয় নকশবন্দী। এইসব তরীকার লোক ও তাদের বই পাঠ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সম্মুখে ওমর (রাঃ)-এর তওরাত পাঠ করাকে

বুযর্গগণ ইবাদত ও আযকার উভয় বিষয়ে এমন পথনির্দেশ দান করেছেন যে, কোন পীর-মুর্শিদের তালক্বীনের প্রয়োজন বাকী থাকে না।

যখন ইবাদতের জ্যোতি ও স্মরণ রাখার বিষয়টি হাছিল হয়ে যায়, তখন তার উপর নিয়মিত আমল করা উচিত। আর যদি এরি মধ্যে কোন বন্ধু মিলে যায়, যার সাহচর্য আকর্ষণের চাবি স্বরূপ হয় এবং তার সাহচর্যের প্রভাব লোকদের উপর পড়ে, তাহ'লে তার সাহচর্য গ্রহণ করবে। যতক্ষণ না উক্ত অবস্থা, স্বভাবে পরিণত হয়ে নিজের মধ্যে দৃঢ়তা লাভ করে। এরপর গৃহকোণে বসে যাবে এবং উক্ত স্বভাবগত ক্ষমতা রক্ষায় লিপ্ত হবে। এ যুগে এমন কেউ নেই যে সকল দিক দিয়ে পূর্ণতা রাখে, কেবল আল্লাহ যাকে চান তিনি ব্যতীত। যদি কেউ এক দিকে পূর্ণ হয়, তো অন্য দিকে সে শূন্য। অতএব যতটুকু পূর্ণতা মওজূদ আছে, সেটুকুই অর্জন করে নেওয়া উচিৎ এবং অন্য বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যক। خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدُرَ 'তুমি স্বচ্ছটুকু গ্রহণ কর এবং ময়লাটুকু ছেড়ে দাও'।

ছূফীদের প্রতি সম্বন্ধ বড়ই গণীমতের। কিন্তু তাদের রীতিসমূহ ফালতু মাত্র। একথা অধিকাংশ লোকের মধ্যে বড়ই কষ্টদায়ক হবে। কিন্তু আমাকে একটি কাজের উপর আদেশ করা হয়েছে। আমাকে সে অনুযায়ী কথা বলতে হবে। কোন যায়েদ-ওমরের কথার উপর আবদ্ধ থাকা যাবে না।

৪র্থ অছিয়ত :

জানা উচিৎ যে, আমাদের ও এ যামানার মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ছূফীমনস্ক লোকেরা বলে থাকেন যে, আসল উদ্দেশ্য হ'ল ফানা, বাক্বা, ইস্তিহলাক ও ইনসিলাখ (অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া, সেখানে স্থায়ী হওয়া, আত্মচেতনাকে ধ্বংস করা ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া)। আর জীবিকার বিষয়গুলি দেখা ও দৈহিক ইবাদতগুলি বজায় রাখা, যেগুলির বিষয়ে শরী'আত নির্দেশ দান করেছে। এগুলি কেবল এজন্য যে, সকলে উক্ত মূল উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অতএব مَا لَا

বরদাশত করেননি *(আহমাদ হা/১৫১৯৫; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৮৯; মিশকাত হা/১৭৭)*।

يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ ‘যার সম্পূর্ণটা অর্জন করা সম্ভব নয়, তার সম্পূর্ণটা বর্জন করাও উচিৎ নয়’।

কালাম শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যেটুকু শরী‘আতে এসেছে, এটুকু ব্যতীত কিছুই উদ্দেশ্য নয়। আর আমরা বলি যে, মানুষের বাহ্যিক আকৃতিকে সামনে রেখে শরী‘আত ব্যতীত অন্য কিছুই উদ্দেশ্য নয়। শরী‘আত প্রণেতা উক্ত মূল বিষয়কে (অর্থাৎ ফানা, বাক্বা ইত্যাদিকে) বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বর্ণনা করেছেন।[৩]

এই সারকথার ব্যাখ্যা এই যে, মনুষ্য জাতিকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার মধ্যে ফেরেশতা শক্তি ও পশু শক্তি একত্রিত হয়েছে। তার সৌভাগ্য নির্ভর করে ফেরেশতা শক্তি বৃদ্ধি করার উপর। আর দুর্ভাগ্য নিহিত থাকে পশুশক্তি বৃদ্ধি করার উপর। সে এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, তার কর্মসমূহের চিত্র ও চরিত্রের রং সমূহ সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয় ও তা নিজের অধিকারে রাখে। আর মৃত্যুর পর সেগুলি সে সাথে নিয়ে যায়; ঠিক সেইভাবে যেভাবে তার দেহ খাদ্যের প্রতিক্রিয়া সমূহ নিয়ে চলে এবং তার ফলে সে বদহযম, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া তার সৃষ্টি এমনভাবে হয়েছে যে, সে জান্নাতে (حظيرة القدس) ফেরেশতাদের সাথে মিলে সেখান থেকে ‘ইলহাম’ এবং ইলহামের মত কিছু হাছিল করে। অতঃপর যদি ঐ ফেরেশতাদের সাথে তার কিছু সম্পর্ক তৈরী হয়, তাহ’লে ইলহাম পাওয়ার কারণে সে খুশী ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা লাভ করে। কিন্তু যদি তাদের থেকে ঘৃণার অবস্থায় থাকে, তাহ’লে সে সংকীর্ণতা ও কষ্টের মধ্যে থাকে। মোটকথা যেহেতু মানুষ ঐভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেহেতু যদি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হ’ত, তাহ’লে অধিকাংশ মানুষকে আত্মিক রোগ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করত। এজন্য আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা* স্রেফ নিজের অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে পরিচ্ছন্ন করেছেন এবং তার নাজাতের জন্য একটি রাস্তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অদৃশ্য

৩. যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ *(মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*। যেটি কেবল বিশেষ মুত্তাক্বীরাই পারেন। তবে এর দ্বারা ফানা, বাক্বা ইত্যাদি নামে পৃথক কোন ইবাদতের তরীকা বুঝানো হয়নি।

যবানের মুখপাত্র হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। যাতে নে'মত পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করা), সেটা পুনরায় তাদের হস্ত গত হয়। অতঃপর মানুষ তার বর্তমান আকৃতিতে বর্তমান ভাষা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট শরী'আত প্রার্থনা করে। যেহেতু সমস্ত মানুষ একই আকৃতিতে সৃষ্ট, সেহেতু তার হুকুম সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় এবং সকলের মধ্যে একই হুকুম জারী হয়। এতে কারু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন দখল নেই। ফানা, বাক্বা, ইস্তিহলাক প্রভৃতি, যা হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি থেকে; তা এজন্য যে, কিছু কিছু মানুষ চূড়ান্ত উচ্চতা ও দুনিয়া ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে তাদের রাস্তায় পৌঁছে দেন। এটি আল্লাহ্র অহি-র নির্দেশ নয়; বরং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। শরী'আত প্রণেতার কালাম উক্ত অর্থ বহন করে না। না প্রকাশ্যে, না ইঙ্গিতে।

একটি দল উক্ত বিষয়গুলিকে শরী'আত প্রণেতার কালাম বলে বুঝে রেখেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি লায়লী-মজনুর কাহিনী শোনে। আর তার প্রতিটি কথাকে নিজের উপর চাপিয়ে নেয়। ঐ লোকদের পরিভাষায় একে ই'তিবার (إعتبار) অর্থাৎ 'প্রভাব গ্রহণ করা' বলা হয়।

মোটকথা ইনসিলাখ ও ইস্তিহলাক-এর বিষয়ে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়া এবং এতে যোগ্য-অযোগ্য যেকোন ব্যক্তির লিপ্ত হয়ে পড়া একটি দুরারোগ্য ব্যাধি (داء عُضال)।[৪] মিল্লাতে মুছত্বফাবিয়াহ্র মধ্যে যে

৪. এখানে কানাডার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 'ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি'র ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ কর্তৃক পরিবেশিত উর্দূ অনুবাদে অনুবাদকের পক্ষ থেকে যোগ করা হয়েছে, اگرچہ بعض استعدادوں کی بنسبت انکی کچھ اصل ہے تاہم عوام کیلئے ایک لاعلاج مرض ہے- 'যদিও কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এটির কিছু ভিত্তি আছে, তথাপি সাধারণ লোকদের জন্য এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি'। অথচ মূল লেখক এটি বলেননি। কারণ ইসলামী শরী'আতে ইবাদতের যে বিধান রয়েছে, তা সবার ক্ষেত্রে সমান। সেগুলিতে ইনসিলাখ-ইস্তিহলাক প্রভৃতির কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র ইত্তেবায়ে সুন্নাহ ও খুশূ-খুযূ ব্যতীত। একইভাবে তিনি ৭ম অছিয়তে শাদী সমূহের (شادیاں) অর্থ শাদীই লিখেছেন এবং